ইউনিট ৮
বন ও বন্যপ্রাণী
সংরক্ষণবিধি

ইউনিট ৮ বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি

বৃক্ষরাজি ও প্রাণীকূল আমাদের বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ। এ প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ও নিরাপদ আবাসস্থল হলো বনভূমি বা বনাঞ্চল। বনভূমিতে বৃক্ষরাজি ও বন্যপ্রাণীদের মধ্যে রয়েছে এক নিবিড় ও চমৎকার সম্পর্ক। প্রাকৃতিক নিয়মেই কোনো বনাঞ্চলে নির্দিষ্ট সংখ্যক গাছপালা ও বন্যপ্রাণী থাকে। কোনো বিশেষ কারণে কোনো বৃক্ষ বা প্রাণীর সংখ্যা মারাত্মক হ্রাস পেলে সেখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এদেশের বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি দ্রুত উজাড় হযে যাওয়ার সাথে সাথে মূল্যবান বৃক্ষসম্পদের বিলুপ্তি ঘটছে এবং পাশাপশি উক্ত বনাঞ্চলে বসবাসকারী বিচিত্র রকমের পশুপাখির নিরাপদ আবাসস্থলও নষ্ট হওয়ায় বন্যপ্রাণীরও বিলুপ্তি ঘটছে। তাছাড়া একশ্রেণীর লোক শখের/লোভের বশবর্তী হয়ে বন্যপ্রাণী অবাধে হত্যা করে আসছে। ফলে এ অমূল্য বনসম্পদ এক ক্রান্তিলগ্নে এসে দাঁড়িয়েছে যার মারাত্মক পরিণতি মানবজীবনে ও পরিবেশে দেখা যাচ্ছে। এ বনসম্পদ দুটোকে রক্ষার জন্য প্রয়োজন কঠোর বিধি বা আইন। বাংলাদেশে বনের বৃক্ষ ও প্রাণী সম্পদগুলোকে রক্ষার জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক আইন বা বিধি। কিন্তু সম্পদগুলোকে সংরক্ষণের জন্য আইন থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে বন উজাড় ও বন্যপ্রাণী শিকার রোধ করা সম্ভব না হওয়ার অন্যতম কারণ হলো আইনের বিধানসমূহ সম্পর্কে এদেশে শিক্ষিত মহল পর্যন্ত সঠিকভাবে অবহিত নন। তাই প্রয়োজন বনবিধি বা বন্যপ্রাণীবিধি সম্পর্কে সকল মহলকে সচেতন করে তোলা এবং তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধির প্রয়োজনীয়তা ও উক্ত বিধিসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

পাঠ ৮.১ বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধির প্রয়োজনীয়তা

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বন সংরক্ষণবিধির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বন সংরক্ষণবিধির প্রয়োজনীয়তা

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে বন ও বনজ সম্পদের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে বনভূমির ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বনসম্পদের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণে বন ও বনজ সম্পদের অবদান আজ সর্বজনস্বীকৃত। পরিবেশ বিপর্যয়ের এ ক্রান্তিলগ্নে পৃথিবীর প্রতিটি সচেতন নাগরিক বনের অপরিসীম গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করছেন। কারণ, কোনো স্থানের পরিবেশ (যেমন– তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধ্বস, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র) সে স্থানের বনাঞ্চল দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

বন যেহেতু মানুষের মৌলিক চাহিদা, যেমন- খাদ্য, আশ্রয়/বাসস্থান, জ্বালানি, বস্ত্র, চিকিৎসা প্রভৃতি পূরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎসস্থল, সেহেতু ঐসব চাহিদা পূরণের নিমিত্তে মানুষ বন ও বনসম্পদ ব্যবহার করবে এটাই সত্য। প্রাচীনকালে লোকসংখ্যা কম থাকায় এবং বনাঞ্চলের জন্য পর্যাপ্ত ভূমি থাকায় বন সঙরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বা বিধির তেমন প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু ধীরে ধীরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ ছাড়াও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা। যেমন– বসতবাড়ি, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং নগরায়ন ও শিল্পায়ন ইত্যাদি পূরণের প্রয়োজনে বনভূমির ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে বনসম্পদের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস

পাচ্ছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এ প্রক্রিয়া তীব্রতর হচ্ছে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে ভূমির পরিমাণ সীমিত কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অধিক।

দেশের বনাঞ্চল উজাড় রোধে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে পূর্বের বন আইনকে অধিকতর সংশোধন করে আইন প্রণয়ণ করেন যা "বন আইন (সংশোধন) ১৯৯০" নামে

বনাঞ্চলে হ্রাসের এ প্রক্রিয়া উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে মানুষের দৃষ্টি বেশি করে আকৃষ্ট করে এবং বনসম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো এ উপমহাদেশেও বন সংরক্ষণের জন্য আলাদা আইন প্রণীত হয় যা 'বন আইন, ১৯২৭ (Forest Act, 1927)' নামে অভিহিত করা হয়। এ আইন সত্ত্বেও অবৈধভাবে বনাঞ্চল উজাড় অব্যাহত থাকে, ফলে দেশ ক্রমান্বয়ে প্রায় বনশূন্যের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। এদেশের পরিবেশের জন্য আবহাওয়াবিদগণের মতে যেখানে ২০-২৫ ভাগ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন সেখানে বনাঞ্চলের পরিমাণ ১০ ভাগের অনেক নিচে। তাই দেশের বনাঞ্চল উজাড় রোধে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে পূর্বের বন আইনকে অধিকতর সংশোধন করে নতুন আইন প্রনয়ণ করেন যা "বন আইন (সংশোধন) ১৯৯০ {The forest (Amendment) Act, 1990}" নামে অভিহিত। এ আইনের পর অবৈধ বন উজারের প্রবণতা কমলেও রোধ করা সম্ভব হয় নি ফলে ১৯৯০ সালের এ আইনকে আরও অধিকতর সময়োপযোগী করার দাবি ওঠে ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে এ আইনের আরও কতিপয় সংশোধনী আনা হয়। ভবিষ্যতে হয়তো বন আইনকে আরও কঠোরতম সাজাসহ সংশোধনীর প্রয়োজন হবে। সুতরাং বন সংরক্ষণবিধির বা আইনের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বন পশুপাখির নিরাপদ আবাসস্থল। বনে বিচিত্র রকমের পশুপাখি বসবাস করে। এসব বন্যপ্রাণী বনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, প্রাকৃতিক সৌন্দয্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বনাঞ্চলে ক্ষুদ্র থেকে বিশালকার প্রাণী রয়েছে। এসব প্রাণী পরিবেশকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বনাঞ্চলে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল একে অপরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। যেমন– সুন্দরবন না থাকলে বাঘ ও হরিণের অস্তিত্ব থাকবে না। সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা হ্রাস পেলে হরিণের সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং বনের প্রয়োজনীয় গাছপালার যথেষ্ট ক্ষতি হবে। তেমনিভাবে আবার হরিণের সংখ্যা কমে গেলে অপ্রয়োজনীয় গাছের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বাঘের খাদ্য সমস্যাও দেখা দিবে। সুতরাং সুন্দরবনে বাঘ, হরিণ ও গাছপালার মধ্যে সুন্দর সমন্বয় রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানের বনাঞ্চল উজাড় হওয়ার ফলে বনের কীটপতঙ্গ শস্যক্ষেতে আসছে এবং এসব কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কীটনাশকের ব্যবহার বাড়ছে। কীটনাশক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ছাড়াও অনেক উপকারী প্রাণী ধ্বংস করছে। তাছাড়া বন উজাড়ের ফলে বনে বসবাসকারী পশুপাখি লোকালয়ে চলে এসে মানুষের শিকারে পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে বন্যপ্রাণীর বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে।

মানুষ তার মানসিক ক্লানি দূর করার জন্য ছুলে চলে যায় লোকালয় থেকে বনাঞ্চলে। বনাঞ্চলের নির্মল বায়ু ছাড়াও বনের বিচিত্র রকমের পাখি ও জীবজন্তু মানুষকে নানাভাবে আনন্দ দেয় এবং ক্ষণিকের জন্য হলেও মানুষ ভুলে যায় তার দুঃখকষ্ট। তাছাড়া বন্যপ্রাণীর চামড়া ও হাড় দিয়ে মূল্যবান দ্রব্যাদি তৈরি হয় যা দিয়ে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। অতএব, বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে আইন প্রণয়ন করেন যা "বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩" নামে অভিহিত।

বনের এ অমূল্য সম্পদ ও অপূর্ব সৌন্দর্য্য একশ্রেণীর লোক নেশার ছলে/লোভে অবাধে নিধন করছে। সুতরাং বন সংরক্ষণবিধির পাশাপাশি বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণবিধি প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ছে। এ লক্ষ্যে, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে আইন প্রণয়ন করেন যা "বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩" নামে অভিহিত। এ আইন প্রণয়নের পরও অবাধে বন্যপ্রাণী নিধন বন্ধ নয় নি। তাই এ বিধি আরও কঠোরতর করার জন্য দেশের সচেতন মহল থেকে জোর দাবি ওঠেছে। অতএব, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধির প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনবিদিত।

সারমর্ম ঃ বৃক্ষরাজি ও প্রাণিকুল এদশের বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ। এ প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ও নিরাপদ আবাসস্থল হলো বনভূমি বা বনাঞ্চল। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণে এদের অবদান অপরিসীম। কোনো স্থানের পরিবেশ সে স্থানের বনসম্পদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। কিন্তু অবাধে বৃক্ষরাজি উজাড় হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বনে বসবাসকারী বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি ঘটছে। ফলে আমাদের পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের এ ক্রান্তিলগ্নে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশে বনের বৃক্ষ ও প্রাণীসম্পদ রক্ষার জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক আইন বা বিধি। বন আইন ও বন্যপ্রাণী আইন থাকা সত্ত্বেও বৃক্ষরাজি উজাড় ও বন্যপ্রাণী নিধন বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বন সংরক্ষণবিধি এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি আরও কঠোরতর করার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। প্রাচীনকালে বন সংরক্ষণের জন্য আলাদা বিধির প্রয়োজন ছিল না কেন?
- ক) বন সম্পদের তেমন প্রয়োজন ছিল না
- খ) বন সম্পদ সংরক্ষণ সম্পর্কে মানুষ খুবই সচেতন ছিল
- গ) বনাঞ্চলের বন্যপ্রাণীকে মানুষ খুব ভয় পেত বলে বনে সচরাচর যেত না
- ঘ) লোকসংখ্যা কম এবং পর্যাপ্ত বনসম্পদ থাকায়

২। এ উপমহাদেশে বনাঞ্চল হ্রাসের ক্ষতিকারক প্রভাবসমূহ কখন থেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে?
- ক) প্রাচীনকাল থেকে
- খ) প্রায় এক হাজার বছর আগে থেকে
- গ) ঊনবিংশ শতাব্দির গোড়া থেকে
- ঘ) বিংশ শতাব্দির দ্বারপ্রান্তে এসে

৩। বর্তমানে বনের কীটপতঙ্গ শস্যক্ষেতে চলে আসার কারণ কোন্‌টি?
- ক) বনে অন্য জীবজন্তুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছে না
- খ) বনে কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায়
- ঘ) বনের চেয়ে শস্যক্ষেত বেশি নিরাপদ আশ্রয়স্থল বলে
- গ) বন উজাড় হয়ে যাওয়ায়

৪। মানুষ তার মানসিক ক্লান্তি দূর করার জন্য কোথায় ছুটে যায়?
- ক) লোকালয়ে
- খ) শহরাঞ্চলে
- ঘ) বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ বনে
- গ) উপাসনালয়ে

পাঠ ৮.২ বনবিধি

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বনবিধি বলতে কী বুঝায় তা লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বনবিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বনবিধি লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান কী তা বলতে পারবেন।

বনবিধি কী?

কোনো অঞ্চলে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি বা সরকারি বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটা , অপসারণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান রয়েছে। এসব আইন বা বিধানকে বনবিধি বা বন আইন বলে। বনভূমির বনজ বৃক্ষ সুষ্ঠভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য এ উপমাহদেশে ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয় যা “বন আইন, ১৯২৭” নামে অভিহিত। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে এ আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন করে যা “বন আইন (সংশোধন), ১৯৯০” নামে পরিচিত। সবশেষে ১৯৯৬ সালে এ আইনের কিছু সংশোধনী আনা হয়। এ আইন বলে বনজ সম্পদ সংরক্ষণের নিমিত্তে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে এবং ঐসব বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান রয়েছে। তাছাড়া সরকার যে কোনো সময় সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোনো ভূমিতে সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। এ প্রজ্ঞাপন বলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা অন্য কোনো ভূমিতে সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। এ প্রজ্ঞাপন বলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা অন্য কোন দাবিদার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হতে নূন্যতম তিনমাস এবং অনধিক চারমাসের মধ্যে বন কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে নিজে হাজির হয়ে ক্ষতির বিস্তারিত উল্লেখ করে আবেদন করতে পারবেন। আবার সরকার একইভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখ হতে সংরক্ষিত কোনো বন বা তার অংশবিশেষ সংরক্ষিত, রহিত এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।

কোনো অঞ্চলে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি বা সরকারী বনাঞ্চল থেকে গাছ কাটা, অপসারণ, পরিবহণ ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন রয়েছে। এ আইনকে বনবিধি বা বন আইন বলে।

বনবিধির বর্ণনা

এ পাঠে বন সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিধি বলে নিম্নলিখিত কাজসমূহ দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। যথা–

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সরকারী বনভূমি থেকে গাছপালা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করা;
- তেমনিভাবে অনুমতি ব্যতীত আধাসরকারি ও স্থানীয় সরকারি জমি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব জমি বা বাগান হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ জেলার যে কোন স্থানে প্রেরণ;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশ করা, বনভূমিতে ঘরবাড়ি ও চাষাবাদ করে বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করা;
- বনাঞ্চলে গবাদিপশু চরানো;
- প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতীত বনের গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহন করা;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ঋতু ব্যতীত অন্য সময়ে আগুন জ্বালানো, আগুন রাখা বা বহন করা;
- বনে কাঠ কাটার অথবা কাঠ অপসারণের সময় অসাবধানতাবশত বনের ক্ষতিসাধন করা, গাছ ছেটে ফেলা, ছিদ্র করা, বাকল তোলা, পাতা ছেড়া, পুড়িয়ে ফেলা অথবা অন্য কোনো প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা;

বিনা অনুমতিতে সরকারী বনাঞ্চলে গাছকাটা, অপসারণ, পরিবহন, ঘরবাড়ি তৈরি, চাষাবাদ করা, গবাদিপশু চরানো, আগুন জ্বালানো এবং বনের কোনোরকম ক্ষতিসাধন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

- বনে শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, জল বিষাক্ত করা অথবা বনে ফাঁদ পাতা;
- বনজ দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অপসারণ, পরিবহন ও হস্তান্তর করা;
- বন কর্মকর্তা অথবা বন রক্ষানেক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান করা;
- যথাযথ অনুমতি ব্যতীত বনের মধ্যে খাদ খোড়া, চুন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো অথবা কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো বনজাত পণ্য সংগ্রহ করা অথবা শিল্পজ দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করা, অপসারণ করা;
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো সংরক্ষিত বনে আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করা।

বন আইন লঙ্ঘনের শাস্ত্রির বিধান

বন আইন ভঙ্গের জন্য জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

বন আইন লঙ্ঘনের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। উপরোক্ত আইন ভঙ্গের জন্য ন্যূনতম ছমাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এসব অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হয়ে থাকে।

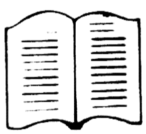

সারমর্ম ঃ বাংলাদেশের বনভূমির বৃক্ষরাজিকে রক্ষার জন্য ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষন আইন করা হয় যা ১৯৯০ সালে সংশোধন করে অধিকতর সময়োপযোগী করা হয়। ১৯৯৬ সালেও এ আইনের কিছু সংশোধন করা হয়। এ আইন বলে বনসম্পদ সংরক্ষণের নিমিত্তে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, যেমন– বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে গাছকাটা, অপসারণ, পরিবহন, ঘরবাড়ি তৈরি, চাষাবাদ করা, গবাদিপশু চরানো, আগুন জ্বালানো এবং বনের কোনো রকম ক্ষতিসাধন করা প্রভৃতি। উপরোক্ত বন আইন লঙ্ঘনের জন্য নূন্যতম ছমাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বনবিধিকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
- ক) বন আইন, ১৯২৭
- খ) বন আইন, ১৯৭৩
- গ) বন আইন, ১৯৯০
- ঘ) বন আইন, ১৯৯৫

২। বনভূমি থেকে গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে কোন্‌টি প্রযোজ্য?
- ক) একেবারে নিষিদ্ধ
- খ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে করা যাবে
- গ) উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে এ শর্তে করা যাবে
- ঘ) সরকারের উচ্চপদে আসীন থাকলে করা যাবে

৩। সংরক্ষিত বনে নিম্নের কোন্‌টি করা যাবে?
- ক) শিকার করা
- খ) মাছ ধরা
- গ) পাতা কুড়ানো
- ঘ) কোনটিই নয়

৪। বন আইন লঙ্ঘণের সর্বনিম্ন শাস্তি কী?
- ক) দুবছরের জেলসহ দুহাজার টাকা জরিমানা
- খ) একবছরের জেলসহ এক হাজার টাকা জরিমানা
- গ) ছমাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা
- ঘ) তিন মাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা

পাঠ ৮.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি

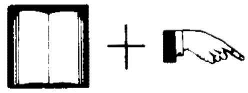

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি কী তা বলতে পারবেন।
- বিস্তারিতভাবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বন্যপ্রাণী বিধি লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান লিখতে পারবেন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি কী?

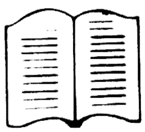

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে "বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩" প্রণয়ন করেন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে আইন প্রণয়ন করেন যা "বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩" নামে অভিহিত। এ আইন বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে বিভিন্নভাবে বন্যপ্রাণী শিকার করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া এ আইন বলে সরকার প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোনো এলাকাকে বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থান হিসেবে ঘোষণা করতে পারবেন।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধির বর্ণনা

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধির উলে-খযোগ্য দিকগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিধিবলে নিম্নেলিখিত বিষয়গুলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। যথা–

যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বনাঞ্চল থেকে যে কোনো বন্যপ্রাণী যে কোনো উপায়ে শিকার বা হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

- শখের বশে বন্যপ্রানী শিকার করা;
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে যে কোন বন্যপ্রাণী শিকার করা কিংবা বিষ প্রয়োগে হত্যা করা;
- বিনা অনুমতিতে যে কোনো বন্যপ্রাণী পোষা;
- বন্দুক, বর্শা, বন্ধুকের ফাঁদ, বিস্ফোরক, বোমা, বড়শি, গ্রেনেড, বৈদ্যুতিক কৌশল, টোপযুক্ত অথবা অন্য কোনো প্রকার ফাঁদ দ্বারা কোনো বন্যপ্রাণী শিকার;
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস বা বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, শর্টগান, কিংবা রাইফেল অথবা ওষুধযুক্ত প্রক্ষেপক অথবা কোনো প্রাণীকে অজ্ঞান করতে পারে, পক্ষাঘাত করতে পারে, সংজ্ঞাহীন করতে পারে এমন রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা কোনো শিকারযোগ্য প্রাণী শিকার করা;
- শিকারের উদ্দেশ্যে মোটরযান, মোটরচালিত নৌযান, যে কোনো ধরনের নৌকা বা বিমান বা অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা;
- বন্যপ্রাণী ধরার চোরাগর্ত, শিকারের গর্ত, পরিখা বা সে ধরনের কোনো গর্ত বা কোনো বেড়া বা ঘেরা নির্মাণ করা;
- শিকারি পাখি অথবা কুকুর ব্যবহার করে শিকার বা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে শিকার করা;
- সরকার কর্তৃক ঘোষিত বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থান এবং জাতীয় উদ্যানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা, বসবাস করা, জমি চাষ করা অথবা এর উদ্ভিদ ধ্বংস করা কিংবা বিদেশী প্রাণী অথবা গৃহপালিত প্রাণী প্রবেশ করানো;
- বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থানে আগুন লাগানো, প্রবাহিত জল নোংরা করা এবং বন্যপ্রাণী প্রজননে হস্তক্ষেপ করা;

- বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থল এবং জাতীয় উদ্যানে এবং এর সীমানার এক মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার, হত্যা বা কৌশলে ধরা;

অনুমতি ব্যতীত বিদেশ থেকে কোনো বন্যপ্রাণী বা মাংস আমদানি করা বা বিদেশে রপ্তানি করা অপরাধ।

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি আঞ্চলিক বা বিদেশী প্রজাতির কোনো জীবন্ত বন্যপ্রাণী অথবা মাংস বাংলাদেশে আনয়ন বা আমদানি করা অথবা রপ্তানি করা;

তবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়। যথা–

মানুষের জীবন বাঁচাতে, ফসলের ক্ষতি রোধ করতে বন্যপ্রাণী হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।

- নিজের কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য কোনো প্রাণীকে শিকার বা হত্যা করা;
- ফসলের ক্ষতি করলে বা ফসল ক্ষেতের মধ্যে বন্যপ্রাণী হত্যা করা;
- গৃহপালিত পশুর ক্ষতিকারক কোনো বন্যপ্রাণী গৃহপালিত পশুর যুক্তিসংগত দূরত্বে অবস্থানকালে হত্যা করা।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান

বন্যপ্রাণী বিধি লঙ্ঘনের জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। উপরোলে- খিত নিষিদ্ধ/দন্ডনীয় বিধানগুলোর লঙ্ঘনকারীকে আদালত সর্বনিম্ন ছমাসের জেলসহ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বৎসরের জেলসহ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন।

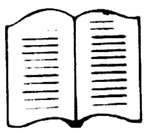

সারমর্ম ঃ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে একটি আইন প্রণয়ন করে যা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ), আদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে যে কোনো উপায়ে বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, বন্যপ্রাণী প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি, জাতীয় উদ্যানের সীমানার এক মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার, বিদেশী প্রাণী আমদানি বা বিদেশে রপ্তানি করা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ আইন লঙ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ আইন ভঙ্গকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেয়ার বিধান রয়েছে। তবে মানুষের জীবন বাঁচাতে, ফসলের ক্ষতি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বাংলাদেশে প্রচলিত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধিকে সংক্ষেপে কী বলে?
- ক) বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, ১৯৭৩
- খ) বন্যপ্রাণী (উন্নয়ন) আদেশ, ১৯৭৩
- গ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন, ১৯৭৩
- ঘ) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন আইন, ১৯৭৩

২। বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ আইনে নিম্নে কোন্‌টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ?
- ক) বন্যপ্রাণী শিকার করা
- খ) গৃহপালিত পশু শিকার করা
- গ) নিজের কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য বন্যপ্রাণী হত্যা করা
- ঘ) কোনো বন্যপ্রাণী বা মাংসের চালান বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করা

৩। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে নিম্নের কোন্‌টি শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়?
- ক) যে কোন কৌশলে বন্যপ্রাণী ধরা
- খ) শিকারি পাখি বা কুকুর ব্যবহার করে বন্যপ্রাণী শিকার করা
- গ) বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থলের এক মাইলের সীমানার মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার করা
- ঘ) ফসলের ক্ষতি করবে এমন বন্যপ্রাণী শস্যক্ষেতে যে কোন প্রকারে হত্যা করা

৪। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি কোন্‌টি?
- ক) মৃত্যুদন্ড
- খ) যাবৎজীবন কারাদন্ড
- গ) দুই বৎসরের জেলসহ দুই হাজার টাকা জরিমানা
- ঘ) পাঁচ বৎসরের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা

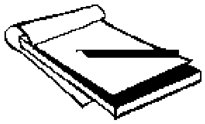

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৮

সংক্ষিপ্ত ও রচনাম লক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বন সংরক্ষণবিধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

২। প্রাণী বনাঞ্চল ছাড়াও দেশের সর্বত্র দেখা যায়, তা সত্ত্বেও বন্যপ্রাণীর জন্য আলাদা বিধির প্রয়োজনীয়তা আছে কী? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন।

৩। বন সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বর্ণনা করুন।

৪। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আদেশ, "১৯৭৩" এর বিশেষ বিশেষ দিকগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫। বাংলাদেশ বনবিধি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিধি লজ্ঘনের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান উল্লেখ করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৮

পাঠ ৮.১

১। ঘ   ২। গ   ৩। ঘ   ৪। গ

পাঠ ৮.২

১। গ   ২। খ   ৩। ঘ   ৪। গ

পাঠ ৮.৩

১। ক   ২। ক   ৩। ঘ   ৪। গ